আমার দেশ, আমার স্বজন

শ্যামাপ্রসাদকে যেমন দেখেছি

চিত্তরঞ্জন মাইতি

[প্রয়াত স্বনামধন্য লেখক তাঁর দীর্ঘ জীবনপরিক্রমায় যেসব ঘটনা বা চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছেন সেগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'নিবোধত' পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'আমার দেশ, আমার স্বজন' শীর্ষক কাহিনিগুলিতে। জীবনের শিক্ষা ও পাঠের স্বাদুতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে অশীতিপর সাহিত্যিকের এইসব মর্মস্পর্শী রচনায়। আমাদের আশা, প্রতিবারের মতো এবারের লেখাটিও সমাদৃত হবে।—সঃ]

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির থেকে বিল্বপত্রে মায়ের সিঁদুর নিয়ে যেতেন আমাদের এক মাস্টারমশাই। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। যখন শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে থাকতেন, তখন কলেজ স্ট্রিট থেকে বাসে চেপে সকাল আটটা-নটার ভেতর তিনি সে-বাড়িতে পৌঁছতেন। শ্যামাপ্রসাদ সেই সিঁদুরের টিপ মাথায় পরতেন।

তখন আমি সবে এম এ পাশ করেছি, কোনও কাজকর্ম নেই। পত্রপত্রিকার অফিসে ছুটোছুটি করি, দু-একটা লেখা প্রকাশিত হলে আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু দক্ষিণা এত কম পাই যে তাতে জলখাবার খাওয়ার খরচও ওঠে না। তাই টিউশনি ইত্যাদি করতে হয়। ওই অধ্যাপকটির বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি মহকুমায়। একই জায়গার মানুষ বলে আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তখন সাধারণ নির্বাচনের দামামা বাজছে। শ্যামাপ্রসাদ একটি দল গঠন করলেন। নাম দিলেন জনসঙ্ঘ। তার একটি মুখপত্র প্রকাশিত হল।

একদিন মাস্টারমশাই আমাকে বললেন, ''তুমি ছোট ছোট কতকগুলো প্রবন্ধ লিখে আমাকে দাও। উপযুক্ত হলে জনসঙ্ঘ পত্রিকায় ছাপার জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবুকে দেব।'' আমি বললাম, ''স্যার, আমি কোনওদিন রাজনীতি করি না, তাই পত্রিকায় স্বনামে লেখা না দিয়ে ছদ্মনামে লেখা দিতে পারি।''

'গ্রাম-পথিক' ছদ্মনামে কয়েকটি প্রবন্ধে আমি গ্রামের মানুষদের কতকগুলো ছবি আঁকলাম। মাস্টারমশাইকে দেখতে দিলাম। কামার-কুমোর, জেলে-জোলা, তাদের সুখ-দুঃখ, বেদনা-বঞ্চনার কাহিনি ফুটিয়ে তুললাম সেই লেখাগুলিতে।

কয়েকদিন পর মাস্টারমশাই আমাকে বললেন, ''তোমার লেখা শ্যামাপ্রসাদবাবুর দারুণ পছন্দ হয়েছে। একদিন তোমাকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাব, তুমি প্রণাম করে আসবে।''

সকাল নটায় দোতলা বাসটি দাঁড়াল শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ির স্টপেজে। বাড়ির মাঝখানে তখন একটা বিশাল আমগাছ ছিল। তাকে ঘিরে দুদিকের মহল। একদিকে থাকতেন স্যার আশুতোষের বড় ছেলে বিচারপতি রমাপ্রসাদবাবু এবং পরিবারের অন্য সবাই। ডানদিকে দোতলা

বাড়িতে তখন একটা বড় হলঘর ছিল। সেটি ব্যবহার করতেন জননায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। সারি সারি চেয়ার পাতা থাকত সেখানে। নানারকম লোক আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর পার্টির অজস্র কর্মী ছাড়াও আশুতোষ কলেজের তিনটি বিভাগের প্রিন্সিপালরা আসা-যাওয়া করতেন। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেটের মেম্বাররা নানারকম সমস্যার সমাধানের জন্য আসতেন।

হলঘরে ঢুকে বসলাম।

ময়লা রঙের মানুষটি, খাটো ধুতি, হলে ঢুকে নিজের শেষপ্রান্তের চেয়ারটির দিকে এগিয়ে গেলেন। শীতকাল, তাই গায়ে একটা সাদা আলোয়ান। ভারিক্কি মানুষটির দুটো চোখ যেন দর্শনার্থীর হৃদয় পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। আমরা উঠে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, ''বেশ লিখছ তুমি। কী করছ এখন?'' আমার বলার আগেই মাস্টারমশাই বললেন, ''দু-চারটে টিউশনি করে সামান্য রোজগার করে। এম এ পাশ করে কলকাতাতেই বসে আছে। দেশের ইস্কুলে চাকরির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।''

হঠাৎ কী ভেবে শ্যামাপ্রসাদ বললেন, ''আশুতোষ কলেজের নাইটে বাংলার পার্টটাইম প্রফেসর দরকার। তুমি আজই খগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করো। বলবে, আমি পাঠিয়েছি।''

সেই সন্ধ্যায় আমি আশুতোষ সান্ধ্য কলেজে চলে গেলাম। এখন তার নাম হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ কলেজ। ইন্টারমিডিয়েটে বহু ছাত্র পড়ত। তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। তাই ১৪ নং-এর বিশাল হলঘরে তাদের ক্লাস হত। বি কম ক্লাসে পড়ত বড় বড় সব ছেলে। কেউ কেউ চাকরি করত অফিসে।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটি আমার বড় করুণ ছিল। সন্ধেবেলা প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, আমার থেকে অনেক বড় বড় ছেলেরা প্রিন্সিপালের টেবিল ঘিরে তাদের সমস্যার কথা জানাচ্ছে। প্রিন্সিপাল উত্তেজিত হয়ে কিছু বলছেন। একসময় ছেলেগুলি বেরিয়ে এল। আমি খগেনবাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। উনি প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বললেন, ''কী চাই তোমার? এখন যাও।'' সবিনয়ে বললাম, ''শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। একটি পার্টটাইম অধ্যাপকের পদ খালি আছে। সেখানে যদি আমাকে কাজ করার সুযোগ দেন।''

প্রিন্সিপাল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার দুয়েক জরিপ করে নিয়ে বললেন, ''তুমি এই বড় বড় ছেলেদের পড়াবে! তুমি এখন এসো, আমি কাল সকালে শ্যামাপ্রসাদবাবুকে যা বলার বলব।'' বুঝলাম, প্রিন্সিপালের দৃষ্টিতে প্রার্থী অনুপযুক্ত।

পরদিন ভোর সাতটার সময় পৌঁছে গিয়েছি শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়িতে। হলঘরের এক কোণে মনমরা হয়ে বসে আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন মাস্টারমশাইয়ের দুটি প্রশংসাপত্র আমার কাছে ছিল; সে-দুটি নিয়ে গেছি। একটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের, অন্যটি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের। শ্যামাপ্রসাদ হলঘরে ঢুকলেন সাড়ে আটটা নাগাদ। আমি গিয়ে প্রণাম করলাম এবং গতরাতে প্রিন্সিপাল খগেন সেনের সঙ্গে যে-কথা হয়েছিল, তা জানালাম। উনি চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

আমি সুনীতিকুমার এবং শ্রীকুমারবাবুর দুটি প্রশংসাপত্র তাঁর হাতে দিলাম। তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিঠি দুটো তাঁর টেবিলে রাখলেন। পাশেই একটা বারান্দা, সেখান থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম খগেনবাবু রাস্তা পেরিয়ে হনহন করে এই বাড়ির দিকেই আসছেন। আমি কথাটা ড. মুখার্জিকে জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন, ''তুমি বারান্দার একদিকে চলে যাও, আমি খগেনের সঙ্গে কথা বলব।'' বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে

আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম। খগেনবাবু বললেন, ''স্যার, একেবারে রোগা পাতলা চেহারার একটি ছেলে, ও কী করে ওর চেয়ে বড় বি কম ক্লাসের ছেলেদের সামলাবে? একেবারে পারবে না স্যার।'' শ্যামাপ্রসাদবাবু বললেন, ''ও না পারলে ওকে সরিয়ে দিয়ো। এই দেখো সুনীতিবাবু, শ্রীকুমারবাবু ছেলেটির সম্বন্ধে কী সব লিখেছেন।'' শ্যামাপ্রসাদবাবুর টেবিল থেকে সেসব তুলে দেখবার সাহস ছিল না খগেনবাবুর। ''আচ্ছা স্যার, ও আজ সন্ধেয় নিশ্চয়ই আসবে কলেজে খবরটা জানতে। ওকে ক্লাসে পাঠিয়ে দেব।'' এরপর খগেনবাবুর প্রস্থান এবং আমার প্রবেশ। বললেন, ''এবার তোমার নিজের ভাগ্য জয় করে নেওয়ার পালা।''

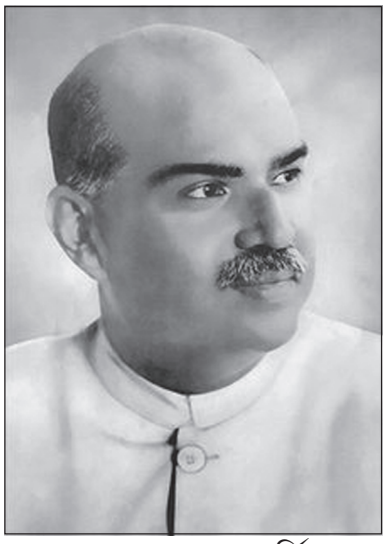
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

সন্ধে সাতটায় আমি খগেনবাবুর কাছে গেলাম। উনি বললেন, ''তুমি ১৪ নং হলঘরে যাও। ইন্টারমিডিয়েট সেকশনে পড়াতে শুরু করো।'' বেয়ারাকে দিয়ে আমাকে ১৪ নং ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। আমি পড়াতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হল ওরা যেন আমার কথা নিবিষ্ট হয়ে শুনছে। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। চারদিকের ক্লাসগুলি থেকে হইহই শব্দ উঠল। বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেরা দুড়দাড় করে নিচে নেমে যাচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ''তোমরা যেতে পার।'' আমাকে অবাক করে দিয়ে ছেলেরা বলল, ''আপনি যদি পড়ান স্যার, তাহলে আমরা এই অন্ধকারে বসেই আপনার কথা শুনব।'' সেদিন প্রাণভরে রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতাটি পড়িয়েছিলাম।

পরদিন শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ি গেলাম কলেজে যাওয়ার আগে। দূর থেকে আমাকে দেখে হৃদয়বান মানুষটি বলে উঠলেন, ''তুমি আমার মুখরক্ষা করেছ চিত্তরঞ্জন। আজ সকালে খগেন এসে তোমার দারুণ প্রশংসা করে গেছে। তুমি নাকি অন্ধকারেও ছেলেদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলে।''

এরপর শ্যামাপ্রসাদকে আমি দেখেছি রাজনীতির ক্ষেত্রে। এমন অপূর্ব ভাষণ দিতেন তিনি যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে যেত, শ্রোতারা আসর ছাড়ত না। শুনেছি তিনি যখন কোনও বিষয় নিয়ে সংসদে বলতেন, তখন লোকসভার সদস্যেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতেন। কংগ্রেস দলের কেউ তখন ছুটতেন পণ্ডিত নেহরুর খোঁজে। পণ্ডিতজি হন্তদন্ত হয়ে এসে সামাল দিতেন পরিস্থিতি।

ড. মুখার্জি দিল্লিতে থাকলেও এই অকিঞ্চিৎকর লেখকের প্রতি তাঁর অশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। পত্রে যোগাযোগ ছিল তাঁর সঙ্গে। একবার দেশে আমার মায়ের অসুখের কথা তাঁকে জানাই। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে তিনি লেখেন : ''শ্রীমান চিত্ত, যত সত্ত্বর সম্ভব তুমি দেশে মায়ের কাছে চলে যাও। মায়ের থেকে বড় আর কেউ নেই। দরকার হলে কলকাতায় এনে তোমার কাছে রেখে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।—আশীর্বাদক শ্যামাপ্রসাদ।''

আর একখানা চিঠির উল্লেখ না করে পারছি না—''শ্রীমান চিত্ত, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। তোমার তো আবার সর্দির ধাত। গায়ে গরম জামা আর চাদর জড়িয়ে থাকবে।—আশীর্বাদক শ্যামাপ্রসাদ।''

এসব টুকরো চিঠি আমার কাছে ছিল ঈশ্বরের নির্দেশের মতো।

আমি কখনও নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়াইনি, তবু যেখানে শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা হত সেখানে সুযোগ পেলেই ছুটে যেতাম। এমন সম্মোহনী শক্তি আর কোনও বক্তার ভাষণে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাঁর ভাষণ ছিল তথ্যসমৃদ্ধ। বাগ্মিতার সঙ্গে তথ্যের সুনিপুণ সমাবেশ সবাইকে অবাক করে দিত। তিনি যখন কোনও দূর অঞ্চলে প্রচারের জন্য যেতেন তখন যাত্রাপথের বহু জায়গায় জনতা তাঁর গাড়ি থামিয়ে দিত। তিনি তাদের কাছে মূল বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে বলতেন, তাতেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত জনতা। ঘনঘন জয়ধ্বনি উঠত জননায়কের। তাঁর গাড়ির সামনে পেছনে আরও দু-একখানা করে গাড়ি থাকত। সুযোগ পেলে আমি সেগুলির কোনও একটাতে জায়গা করে নিতাম।

পথের ধারে মহিলারা শঙ্খধ্বনি করে তাঁকে বরণ করতেন, মালা পরাতেন। ফল, পিঠে ইত্যাদি আনতেও দেখেছি। তিনি সেসব আমাদের ভাগ করে দিতেন। বাড়ি থেকে যেদিন বেরোতেন সেদিন তাঁর স্নেহময়ী বউদি (বিচারপতি রমাপ্রসাদের স্ত্রী) একটি টিফিন ক্যারিয়ারে তাঁর খাবার ভরে দিতেন। এসব খবর আমাকে বলতেন রমাপ্রসাদের মধ্যমপুত্র শিবতোষদা। তিনি ছিলেন দিল্লি ইউনিভার্সিটির সায়েন্স ফ্যাকালটির ডিন।

কাঁথি অঞ্চলে একবার বন্যায় ভেসে গেল দিকদেশ। তার আগে ব্রিটিশ সরকার ধান-চাল গোলায় তুলে রেখেছিল সৈন্যদের জন্য। জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা তখন প্রবল। হাহাকার উঠল চতুর্দিকে। বন্যাপীড়িতদের ঘরে অন্ন নেই একমুঠো। শ্যামাপ্রসাদ মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটির মাধ্যমে দুর্গতদের বস্তা বস্তা গম ও চাল পাঠাতে লাগলেন। সমুদ্রপীড়িত অঞ্চলের মানুষজন তাঁর জয়ধ্বনি দিতে লাগল। আমিও সেসময় তাঁর দাক্ষিণ্য লাভ করি।

এবার সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে জননায়ক শ্যামাপ্রসাদকে ধরবার চেষ্টা করব। ভোটের সময় জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করছেন তিনি। হঠাৎ খবর এল, এক প্রৌঢ় মানুষ গান্ধীজির আদর্শে জীবনযাপন করেন। তিনি এক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক। পরনে ধুতি। তারই এক অংশ বুকে পিঠে জড়িয়ে থাকেন। রুগ্ন শীর্ণকায় মানুষটি। শ্যামাপ্রসাদ নিজেই গেলেন তাঁর কাছে। তাঁকে রাজি করালেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। সবিনয়ে মানুষটি জানালেন, তিনি রাজনীতির চর্চা করেন না, ও-বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর নেই। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, ''আপনাকে ভাষণ দিতে হবে না, সে-কাজটা আমিই করব। আপনি শুধু মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে বলবেন, 'আমাকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন'। '' সেবার ওই প্রধানশিক্ষক এক নামি কংগ্রেস নেতাকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করেছিলেন।

আর একটি ঘটনায় শ্যামাপ্রসাদের শ্রদ্ধাশীল দরদি মনের পরিচয় পেয়ে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। নির্বাচনের ব্যাপারে উনি কাঁথিতে আসছেন। সংবাদ পেয়ে আমি শীতলপ্রসাদ মাইতি মশাইয়ের বাড়িতে হাজির হয়েছি। ওখানে সদলবলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। দানবীর শীতলপ্রসাদের এক পুত্র জনসঙ্ঘের প্রার্থী হয়েছেন।

দশটা থেকে সবাই প্রতীক্ষা করছেন। শ্যামাপ্রসাদ এসে পৌঁছলেন বেলা আড়াইটায়। পথে পথে সভা করে আসছেন তাই এ-বিলম্ব। এসেই বললেন, ''এরা ক্ষুধার্ত। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো।'' গৃহকর্তা বললেন, ''ওদের বসিয়ে দিয়েছি স্যার।'' ''আমার জন্য কী ব্যবস্থা করেছ?'' ''লুচি, আলুভাজা, আর বাদামবরফি। এখনি হয়ে যাবে স্যার। দুটো উনুন জ্বলছে। একটাতে লুচি ভাজা হবে, অন্যটাতে আলুভাজা।'' ছেলেমানুষের মতো শ্যামাপ্রসাদ বলে উঠলেন, ''আমার টেবিলে একটা প্লেট রাখো, আলুভাজা আর লুচির মধ্যে যেটা আগে হবে সেটা দিয়ে যাবে।''

একটু দূরে দরজার মুখে বসে আছি, ব্যাপারটা উপভোগ করছি। এত বড়মাপের একটি মানুষের ভেতর এমন এক দেবশিশু কী করে লুকিয়ে থাকে!

খাওয়া শেষ হলে পাশের ঘরে উনি বিশ্রামের জন্য গেলেন। আমাকে ঘরে ডেকে নিলেন। ধবধবে বিছানা। গায়ে চাপালেন মোটা, প্রায় সাদা একখানা কম্বল। তিব্বতি ভেড়ার সাদা লোমে নাকি তৈরি। কেউ উপহার দিয়ে থাকবেন। এ-অঞ্চলে যে-রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছিল তার বিবরণ দিতে লাগলেন আমাকে।

আমি দুধওয়ালি পদ্মার গল্প বললাম তাঁর কাছে। কাঁথির দক্ষিণ দিকে জুনপুট যাওয়ার রাস্তার ধারে ছিল তার গ্রাম। স্বামী ছিল চৌকিদার। সে ভোরবেলা বাড়ি বাড়ি দুধ জোগান দিত। তখন চলছে স্বাধীনতার রক্তঝরা সংগ্রাম। সামনে কোর্টকাছারি আর থানা, উঁচু প্রাচীর দেওয়া জেলখানা। সেখানে বন্দুক হাতে পাহারাদাররা সবসময় মজুত। লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন চলছে তখন। গান্ধীজী ডান্ডিযাত্রার নির্দেশ ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, ''হাম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে, তমাম হিন্দুস্থান উথল যায়েগা।'' কাঁথির দারুয়া ময়দান একটি বিখ্যাত স্থান। বহু সভাসমিতি ওখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জায়গাটা তখন বেশ উঁচু ছিল। পাশে বালির পাহাড় ডিঙিয়ে বহুকষ্টে ওঠানামা করে গাঁয়ে যেতে হত। লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ফরমান জারি হল, কেউ ময়দানে যেতে পারবে না। রাতেই কিন্তু বহু স্বেচ্ছাসেবক সেখানে জমায়েত হয়েছিল। তারা এক কলসি সমুদ্রের লোনা জল পেলেই জালন দিয়ে নুন তৈরি করবে। কিন্তু কে আনবে এই জল? সমুদ্রের দিকে সব রাস্তাটাই মিলিটারি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, মাছিটিও গলার উপায় নেই। এমন সময় দেখা গেল এক যুবতী কলসি কাঁখে দারুয়া ময়দান পেরিয়ে থানার রাস্তায় এগিয়ে আসছে। এই সেই দুধওয়ালি পদ্মা। একসময় সে স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বক্তৃতা শুনে এমন উদ্দীপ্ত হয়েছিল যে স্বামী সরকারি কাজ করলেও সে দেশের জন্য মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল।

মেয়েটি দারুয়া ময়দান পেরিয়ে অবলীলায় এগিয়ে এল সশস্ত্র রক্ষীদের দিকে। একটি পুলিশ তার কাছে জানতে চাইল, ''কোথায় চলেছ তুমি কলসি নিয়ে?'' ''সরকারি পুকুর থেকে খাবার জল নিয়ে যাব গো। আমাদের এলাকার সব পুকুরের জলই খারাপ হয়ে গেছে।'' ওরা কলসি পরীক্ষা করল। তারপর জল আনার অনুমতি পেল সে। ''যাওয়ার সময় আমাদের দেখিয়ে নিয়ে যাবে।''

জল নিয়ে ফিরে এল পদ্মা। বলল, ''তোমাদের লোটা দাও, জল ভরি দিব। খুব ঠান্ডা জল, এক ঢোক খাইলেই প্রাণ জুড়াবে।'' ওরা পদ্মার দেওয়া জল পরীক্ষা করে দেখল। তারপর তার যাওয়ার অনুমতি মিলল। সে ছন্দিত লয়ে দারুয়ার ময়দান পেরিয়ে নেমে গেল গাঁয়ের দিকে। এভাবে বেশ কয়েকদিন পদ্মাকে আসা-যাওয়া করতে দেখা গেল।

প্রতিদিনই পদ্মার সঙ্গে মজার মজার গল্পে মেতে থাকত পুলিশ। এরপর তার জল আর তারা পরীক্ষা করত না। এক অমাবস্যার রাতে বহুদূর পথ ঘুরে সমুদ্রের জল নিয়ে সরকারি পুকুরের ধারে এক ঝোপের আড়ালে রেখে গেল এক স্বেচ্ছাসেবী। পরামর্শমতো সকালে সেই কলসি কাঁখে নিয়ে রক্ষীদের সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে দারুয়া ময়দানে চলে এল পদ্মা। কিছুপরে পুলিশ দেখল, এক বটগাছের তলায় ধোঁয়া উঠছে। সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। ময়দানের দিকে ছুটল বহু সশস্ত্র পুলিশ। শুরু হল বেধড়ক মার। হাত-পা ভেঙে যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল।

শুধু সেখান থেকে সরে গেল না একজন। সে তখন বিরাট এক বটগাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। তার পায়ের কাছে হাঁড়ির জল ফুটে তৈরি হচ্ছে লবণ। পুলিশেরা একটা মোটা

কাছি এনে পদ্মার মুখটাকে গাছের দিকে করে জড়িয়ে বাঁধল। থানার বড় সাহেব মি. দোঁহা-র চাবুক চলল তার পিঠের ওপর। রাগে দোঁহা সাহেব যত কাঁপছেন ততই হাতের চাবুকখানা পদ্মার পিঠের চামড়া ভেদ করে মাংস কেটে কেটে বের করছে। অচৈতন্য না হওয়া পর্যন্ত সমানে চাবুক চলেছিল। শেষে কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছিল একরাশ চুল সমেত মাথাটা।

পদ্মাকে সেই অবস্থায় কুকুর, শেয়াল আর শকুনির খাদ্য হিসাবে রেখে বীরপুঙ্গবেরা মার্চ করতে করতে চলে গেল। গভীর রাতে স্বেচ্ছাসেবীরা পদ্মার বাঁধন খুলে তাকে নিয়ে পালিয়ে গেল গ্রামে। পাঁচ মাস লেগেছিল তার পিঠের ঘা শুকোতে। কিন্তু শুকিয়ে গেলেও প্রায় কোয়ার্টার ইঞ্চ করে গর্ত হয়ে গিয়েছিল পিঠে।

বলিহারি দিতে হয় মি. দোঁহাকে। শিল্পীর দক্ষতায় উনি এমন চাবুক চালিয়েছিলেন যাতে প্রায় দু-ইঞ্চি অন্তর অন্তর চাবুকটি কেটে বসেছিল পিঠে।

আন্দোলনের প্রবাহে আমি গ্রাম থেকে এসে পড়েছিলাম কাঁথি শহরে। সেখানে জননী পদ্মাকে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল রণরঙ্গিণী মূর্তিতে। ছাত্রদের সমাবেশে আগুন-ঝরা বক্তৃতা দিতে দিতে জননী পদ্মা উত্তেজিত হয়ে টেনে সরিয়ে দিতেন পিঠের আবরণ। চিৎকার করে বলতেন, ''দেখো, দেখো আমার পিঠের ঘাগুলো। বাইরে ঘা শুকিয়ে গেছে কিন্তু মনের ভেতরে দগদগ করছে ঘা।'' তখন বড় বড় নেতাদের মতো পদ্মা পাল ছিলেন আমাদের কাছে জ্বলন্ত এক প্রেরণা।

উত্তেজিত কৃষক আর ছাত্রজনতা বাঁধ কেটে কেটে মিলিটারি গাড়ির পথ রোধ করত, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসত ঝাঁকঝাঁক গুলি। লুটিয়ে পড়ত তরতাজা কত প্রাণ! আহত, মৃত, অর্ধমৃতদের ট্রাকে বোঝাই করে মিলিটারিরা নিয়ে যেত হাসপাতালে। টেনে টেনে ফেলে দিত হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। আবার গাড়ি ছুটত আহত সংগ্রামীদের বয়ে আনার জন্য।

সমস্ত আহত মানুষকে জায়গা দিতে পারা সম্ভব ছিল না হাসপাতালে। গাদাগাদি হয়ে সব পড়ে থাকত বারান্দায় আর উঠোনে। কোনও কোনও মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে 'বন্দেমাতরম্', 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনিত হত।

হাসপাতাল থেকে কয়েক পা দূরে 'খড়্গচণ্ডী' শ্মশানক্ষেত্র। কর্ডন করে রাখত সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। ট্রাক-বোঝাই মৃতদেহ গিয়ে পড়ত সেখানে। জনতাকে বহু দূরে হটিয়ে দিত আর্মড ফোর্স। তারপর স্তূপীকৃত শবে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালানো হত।

গভীর রাত। শ্মশানক্ষেত্র থেকে সরে গেছে পাহারা। পেছনের জঙ্গল চিরে উঁচু ঢিবির বালি আঁচড়ে আঁচড়ে উঠে এসেছে একটা ছায়ামূর্তি। শ্মশান থেকে হাতড়ে হাতড়ে কীসব সংগ্রহ করে নিয়ে আবার নেমে গেছে।

পরদিন মিছিলের জন্য জমায়েত হয়েছে ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক আর সাধারণ মানুষের দল। অমনি তাদের দিকে এগিয়ে এলেন বীরাঙ্গনা পদ্মা। রাতের অন্ধকারে শ্মশান থেকে সংগ্রহ করা চিতাভস্ম নিয়ে নির্ভীক সংগ্রামীদের ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়ে বললেন, ''এরা গুলির মুখে ভয় পায়নি, পিছিয়েও যায়নি। তোদের ওই তিলকের ভেতর রইল এই দেশভক্ত মহা সাহসী মানুষগুলির আশীর্বাদ। তোরা এদের কথা স্মরণ করে এগিয়ে যা। কোটালের বানের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যা ওই বন্দুকধারী পুলিশগুলোকে।'' বিদ্রোহিনী পদ্মা তখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণের মধ্যে ছিল আগুনের দীপ্তি। মিছিলকারীরা তাঁর হাতে পতাকা ধরিয়ে দিয়ে সবার সামনে এগিয়ে দিত। তাঁকে দেখে মনে হত, স্বয়ং ভারতমাতা যেন তাঁর সন্তানদের আগলে নিয়ে চলেছেন।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি পদ্মা-মা

বাতাবি লেবু গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরে বললাম, ''কেন কাঁদছ মা?'' আমার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে বললেন, ''আন্দোলনে আমার কতগুলো ছেলে মারা গেল, আর আমি কাঁদব না?'' একটু পরে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, ''আমি গয়ায় বাছাদের পিণ্ড দিতে যাব।'' আমি আর কিছু বললাম না।

সত্যিই একদিন জননী পদ্মা চললেন গয়ায় তাঁর মৃত সন্তানদের উদ্দেশে পিণ্ড দিতে। প্রায় দশদিন পর গয়া থেকে এল একটি টেলিগ্রাম। তাতে লেখা ছিল, পদ্মা দেবী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে দাহ করে চিতাভস্ম ফল্গু নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই কাহিনিটুকু আমি সেই সন্ধ্যায় বলেছিলাম শ্যামাপ্রসাদবাবুকে।

পরদিন একটা গাড়িতে জুনপুটের রাস্তায় শ্যামাপ্রসাদ বেরিয়েছেন। মাইল দুয়েক দূরে একটি সভায় যোগ দেবেন। অজস্র লোক ভিড় করে চলেছে তাঁর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে। একটুখানি এগোবার পর আমি বললাম, ''ওই গ্রামটা পদ্মার, যার কথা কাল রাতে আমি আপনাকে বলেছিলাম।''

শ্রদ্ধাশীল শ্যামাপ্রসাদ সেই মুহূর্তে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। দুহাত জোড় করে পদ্মার উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করলেন। তারপর প্রায় মাইল দেড়েক পথ হেঁটে চললেন তিনি। সেদিন আমি শ্যামাপ্রসাদের এই রূপ দেখে অভিভূত হয়েছিলাম।

সকলেই জানেন, কাশ্মীরের মহারাজা তাঁর রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। এই নিয়ে চলছিল বিবাদ। কাশ্মীর নিয়ে ভারত সরকারের টালবাহানা শ্যামাপ্রসাদের পছন্দ হয়নি। তিনি অবিলম্বে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাশ্মীর যাত্রা করেন। সেখানে তিনি বন্দি হলেন।

একদিন ভেসে এল বিষাদসংবাদ। শ্যামাপ্রসাদ আর নেই। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ-সংবাদ প্রচারিত হলেও বহু মানুষ এখনও তাঁর মৃত্যুকে রহস্যজনক বলে মনে করেন।

রাত্রি নটায় শবদেহ নিয়ে প্লেন এল দমদম বিমানবন্দরে। চন্দনে চর্চিত করে একখানি লাল রেশমি চাদর মুড়ে দেহখানি নামানো হল। পুষ্পে পুষ্পে ভরে গেল শবাধার। পথে পথে ভিড় জমতে লাগল। শোকার্ত মানুষের মিছিল চলল শববাহী গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দাহ করা হবে তাঁকে।

গাড়ি পৌঁছল ভবানীপুরে মুখার্জি নিবাসের সামনে। তখন বিশাল চওড়া রাস্তাটা জনারণ্য। আমি ভোর থেকে তাঁর বাড়ির দোতলায় আমগাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। পায়ে পাদুকা ছিল না।

একসময় জনসমুদ্রের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে একখানা ফুলে-ভরা তরণী মহাকালসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল।

শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উক্তি মনে পড়ে। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরামন বলেছিলেন, ''শ্যামাপ্রসাদজী ছিলেন সংসদের সিংহস্বরূপ।'' তাই তাঁকে 'ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ' নামে অভিহিত করা হত। আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে লিখেছিলেন, ''তুমি বাপকা ব্যাটা হইয়াছ।'' কাজি নজরুল ইসলাম তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এই বলে—''আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব। সেদিন বাঙালীর আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে। আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকার নায়ক।''